ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 965-974
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.312

‘বাতাসে লাশের গন্ধ’ অবলম্বনে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহের কবিতার কথা

শ্রেয়সী রায়, *গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 23.02.2026; Accepted: 07.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Are the poetry of Bangladesh and Bengali poetry synonymous? For a literary enthusiast from West Bengal, this question is complex, multidimensional, and layered. From the Partition of India in 1947, through the historic Language Movement of 21st February 1952, to the birth of the new nation-state called Bangladesh in 1971, the political, social, and surrounding realities of East Bengal underwent repeated transformations. This history differs in many significant ways from that of India and West Bengal. Such distinct socio-historical developments have shaped the literature— especially the poetry— of East Bengal and later Bangladesh with unique thematic concerns and expressive modes.

Rudra Muhammad Shahidullah was one of the leading poets of 1980s Bangladesh. Like many other poets and writers of his time, his works embodied and nurtured the multidimensional definitions of a newly formed nation and national identity. His first poetry collection, *Upadruta Upakul* includes one of his most popular and well-known poems: ‘Batashe Lasher Gondho’. Through a close critical reading of this poem, the present study explores Rudra’s poetic universe. At the same time, it brings into focus the broader landscape of Bangladeshi poetry. Furthermore, it attempts to demonstrate how Rudra’s poems remain urgent and relevant—from his own time to the present—in the socio-political environment and realities of Bangladesh. In essence, the discussion aims to reflect upon three interrelated perspectives: the poetry of East Bengal and Bangladesh, the nationalism shaped by the Language Movement, and the poetic consciousness of Rudra Muhammad Shahidullah.

Keywords: Rudra Mohammad Shahidullah’s works, ‘Batashe Lasher Gondho’, 1952 Bengali language movement (*Ekusher andolon*), *Ekushe February*-inspired literary tradition, post-1947 poetry in East-Pakistan, Post-Independence Bangladeshi Poetry, Nationalism in Rudra’s works, Language and cultural identity in Rudra’s works

।। ১ ।।

‘বাংলাদেশের কবিতা’ কী? এই সংজ্ঞায়ন কখন এবং কীভাবে আলাদা হয়ে গেল ‘বাংলা কবিতা’-র বৃহত্তর পরিধি থেকে? দু’মলাটের কোনো কবিতা সংকলন থেকে যদি সরিয়ে ফেলা যায় নাম-ধাম, পরিচয়পত্র, তাহলে বাংলা কবিতার তন্নিষ্ঠ পাঠক কি তাকে চিনে নিতে পারেন পৃথক কোনো দেশ-কালের উৎসজ হিসেবে? এর জবাবের মুখ একাধিক। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক; ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক। স্বাধীনতা আর দেশভাগ যে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে দিল ৪৭-এর অগাস্টে, তা কেবল মানচিত্রগত দেশ নয়, মনোদেশ আর

ভাষাদেশেও নতুন শিল্প-সংস্কৃতির অভিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করল। অবশ্যই অটুট রইল অখণ্ড বাংলার সাহিত্যচর্চার দীর্ঘ ঐতিহ্য আর উত্তরাধিকারও। কিন্তু নবগঠিত রাষ্ট্রের জাতিসত্তা; তার অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, আবেগ— সর্বোপরি, ভাষার স্বাধিকার-রক্ষার জন্য একুশে (১৯৫২) তার শ্রদ্ধেয় সংগ্রাম আর শপথ— এই ভূখণ্ডের নিজস্ব লেখালেখিতে আর নতুন লেখকদের মধ্যে পৃথক চেতনা আর প্রকাশভঙ্গির স্পষ্ট ছাপ তৈরি করে দিল। পাশাপাশি কবিতার শৈলী নির্মাণেও কিছু কিছু ভিন্নতা পাওয়া গেল, বিশেষত পূর্ববঙ্গীয় বিভিন্ন জেলার আঞ্চলিক শব্দাবলির প্রয়োগে (ঔপভাষিক বিচ্যুতি বা dialectal deviation)।

পূর্ব-বাংলার (তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান) প্রথম স্বতন্ত্র কাব্যসংকলন 'নতুন কবিতা' প্রকাশিত হয় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের মার্চে (চৈত্র, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ), ঢাকা থেকে। সম্পাদনা করেন দুই তরুণ কবি আশরাফ সিদ্দিকী ও আবদুর রশীদ খান। পুব বাংলার বেশ কয়েকজন তরুণ কবির রচনা এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।[১] এর মুখবন্ধে বলা হয়েছিল— "'কাব্য-মালঞ্চ' যেখানে শেষ সেখান থেকেই আমাদের শুরু।" ['কাব্য-মালঞ্চ' ১৯৪৫-এ প্রকাশিত কিছু মুসলমান কবির রচনা-সংকলন।] এই 'নতুন কবিতা'-কেই বলা যেতে পারে 'বাংলাদেশের কবিতা'-র দিশারী। এই সংকলনে উপস্থিত মোট ১৩ জন কবির অধিকাংশই পরবর্তীকালে 'বাংলাদেশের কবিতা'-র অগ্রদূত হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন।

মধ্য-পঞ্চাশ ও ষাটের দশক পূর্ববঙ্গের কবিতার পক্ষে অত্যন্ত উর্বর কাল-পর্ব। ভাষা-আন্দোলনের ফলশ্রুতি আবেগে, উত্তেজনায়, ক্রোধে, প্রতিরোধে সে-দেশের কবিতার গোলাঘর তখন ভরে তুলেছে অজস্র ফসলের দানে। অথচ ৭৩ থেকে ৭৫— এই পর্বের কবিতায় প্রকট হয়েছে অবক্ষয়ের ছবি। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নতুন দেশ ও জাতি তখন দিশাহীন। যে আলোকোজ্জ্বল স্বপ্নদিনের ছবিকে সামনে রেখে চলেছিল দু'-দশক ব্যাপী সংগ্রাম— মুক্তিযুদ্ধ; তার বাস্তব পরিণতিটি হলো রক্ত-পঙ্কিল, অন্ধকার; স্বার্থ ও ঈর্ষার কলুষে মলিন। কবিরা দেশ ও সমাজের সেইসব ভাঙা স্বপ্নের বেদনাকে, ব্যর্থতা আর গ্লানিকে, হতাশা ও পাপের ছবিকে বারবার ফিরিয়ে এনেছেন কবিতায়। বিশেষত, ১৫ই অগাস্ট ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার পর দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রের পাশাপাশি কবিতার শারীরচিত্রেও দেখা দিয়েছিল বাঁকবদলের দিকচিহ্ন। এই পর্বের তরুণ কবিরা ভাষা-বিজয় আর স্বাধীনতা লাভের প্রাক্তন গৌরবকে অন্তঃস্থ করেও বর্তমানের সংশয় আর সংঘাতে তাড়িত হয়েছেন বারংবার।

১৯৫৬ সালের ১৬-ই অক্টোবর বরিশালে জন্ম কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহের। পিতৃসূত্রে তাঁর স্থায়ী নিবাস অবশ্য ছিল বাগেরহাট জেলার মংলা থানার অন্তর্গত সাহেবের মেঠ গ্রামে। বাবা শেখ ওয়ালীউল্লাহ ছিলেন মংলা ডক লেবার হাসপাতালের চিকিৎসক। মা শিরিয়া বেগম। দশ ভাইবোনের মধ্যে রুদ্র সর্বজ্যেষ্ঠ। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার ওয়েস্ট এণ্ড হাইস্কুল থেকে বিজ্ঞান শাখায় প্রথম বিভাগে এসএসসি (দশম শ্রেণির চূড়ান্ত পরীক্ষা) পাশ করার পর ঢাকা কলেজে কবি ভর্তি হন মানবিক (হিউম্যানিটিজ) শাখায়। ১৯৭৫-এ সেখান থেকেই দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন এবং বাংলা বিভাগে বিএ (অনার্স)-তে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৮০-তে অনার্স এবং ১৯৮৩-তে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন রুদ্র। ঢাকা কলেজে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই সাহিত্য এবং রাজনীতি— এই দু'য়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটে, এবং দুই-ই এরপর ছিল তাঁর ৩৪ বছরের স্বল্পায়ু জীবনের আমৃত্যু সহচর। ছাত্রজীবন থেকেই একের পর এক রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন রুদ্র; এই পর্বেই পর পর প্রকাশিত হয়েছে তাঁর দু'টি কাব্যগ্রন্থ : ১৯৭৯-তে 'উপদ্রুত উপকূল' ও ১৯৮১-তে 'ফিরে চাই স্বর্নগ্রাম' (কবির ব্যবহৃত বানান)। দু'টি কাব্যগ্রন্থই বিপুল সমাদর ও পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে, এমনকি একাধিক পুরস্কারে ভূষিত হয়ে তাঁকে কবিখ্যাতিতে এনে দিয়েছিল অসন্দিগ্ধ প্রতিষ্ঠা। তাঁর আজীবনের দুই কবিতামুখ— প্রেম-অপ্রেমের দ্যুতিময় শিল্পিত রচনা; এবং

কিছুটা উচ্চগ্রামে বাঁধা বিবৃতিধর্মী মঞ্চসফল কবিতা— তাঁর কলমে নিশ্চিত ভাবে ধরা দিয়েছিল এই দু'টি প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই। কাব্যগ্রন্থ-দু'টির অভিধাতেই ('উপদ্রুত' উপকূলবাসীর প্রতি সমমর্মিতা এবং হৃত 'স্বর্ণগ্রাম' ফিরে পাবার আর্তি) বিধৃত হয়েছে তাঁর অনস্বীকার্য রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক সচেতনতার প্রতিচ্ছবি।

।। ২।।

বাঙালি আর মুসলমান— অতিপরিচিত এই শরৎচন্দ্রীয় বিভ্রান্তিটিকে বাদ দিলেও হিন্দু বাঙালি আর মুসলমান বাঙালির মধ্যেকার আমরা-ওরা বিভাজন চিরকালই আকাশচুম্বী। সেই দূরত্ব থেকে বৈষম্য— আর তারপর কূটনৈতিক দ্বৈধ। অতএব দ্বিজাতিতত্ত্বের ধাক্কায় গঙ্গা থেকে যখন আলাদা হয়ে গেল পদ্মা, তখন পদ্মাকে ঘিরে বয়ে চলা জীবনের সাহিত্যে আর সংস্কৃতিতেও স্পষ্ট হতে শুরু করল পার্থক্যের ছাপ। তবু ৪৬ – ৪৭-এ জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্ব সার্বিকভাবে বাংলা ও বাঙালির পক্ষে যতখানি বেদনার; যতখানি ক্ষয়, ক্ষতি আর ক্ষতের সংবাহক— ৫১ থেকে ৭১-এ মুজিবুর রহমানের দ্বিজাতিতত্ত্ব, আর তৎপ্রসূত সংগ্রাম দুই বাংলার বাঙালির পক্ষেই ততখানি-ই গৌরবের। দেশের নামে, জাতির নামে, ধর্মের নামে পৃথিবী জুড়ে ক্রমাগত হয়ে চলা রক্তপাতের সুদীর্ঘ ইতিহাসের মাঝে ভাষার জন্য রক্তক্ষয় সেই প্রথম। ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারি। মাতৃভাষার অধিকারের দাবিতে শুরু হওয়া সেই লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই বিভাজিত বঙ্গভূমি অর্জন করেছিল জাতীয়তার পৃথক অভিজ্ঞান, স্বকীয়তার নতুন সংজ্ঞা— যার ফলশ্রুতিতে ৭১-এর ডিসেম্বরে অবশেষে গড়ে উঠল নতুন দেশ, পৃথক মাতৃভূমি। স্বভাবতই 'একুশ' তাই নবসৃষ্ট জাতির অচ্ছেদ্য আবেগ, উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্যের সূচক। এবং অনিবার্যভাবেই এই একুশের সঙ্গে এরপর ক্রমশ যুক্ত হতে থেকেছে আরও অনেক অনেক মাত্রিকতা। 'একুশ' হয়ে উঠেছে যাবতীয় প্রতিরোধের প্রতীক, দৃপ্ত স্বাজাত্যাভিমানের দ্যোতক। পূর্ব পাকিস্তানের জন্ম মুহূর্তেই কিন্তু উপ্ত হয়েছিল এই সংগ্রামটির বীজ। যে ধর্মকেন্দ্রিক দ্বিজাতিতত্ত্বকে ঘিরে বাংলার বিভাজন, তাই-ই হয়ে দাঁড়িয়েছিল পরবর্তী ভাষা দ্বৈরথটির মূল। বাংলাদেশের নতুন কবিতাধারার অন্যতম পুরোধা, 'দুঃখিনী বর্ণমালা'-র মরমী পরিপালক কবি শামসুর রহমান তাঁর স্মৃতিচারণায় যেমন বলছেন—

> "পাকিস্তান আমলে বাংলা ভাষার উপর উৎপীড়ন হয়েছে নানাভাবে। পাকিস্তানি শাসকদের অপশাসনের অত্যাচার শুধু এদেশের বাসিন্দাদেরই ভোগ করতে হয় নি, বাংলাভাষাকেও নিপীড়নের কাণ্ড-কারখানা দেখতে হয়েছে। ... ছেলেবেলায় একটি সুবোধ্য কবিতা মুখস্থ করেছিলাম। কবিতাটির প্রথম দু'টি পঙক্তি হল—
>
> 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
> সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।'
>
> দুঃখের বিষয়, এ-কথা বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি এই পঙক্তি দু'টিকে পাকিস্তান আমলে বদল করা হয়েছিল এভাবে—
>
> 'ফজরে উঠিয়া আমি দিলে দিলে বলি
> সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।'
>
> কোনো কবির লেখা পালটে দেয়ার অধিকার বিশিষ্ট পণ্ডিতেরও নেই। 'দিলে দিলে বলি' কোন্ কিসিমের বাংলা? এ ধরনের বেয়াদবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গেও হয়েছে। তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতা 'চল চল চল'। এই কবিতার একটি পঙক্তি এরকম 'নব নবীনের গাহিয়া গান, সজীব করিব মহাশ্মশান'। পাঠ্যবইয়ে কোনো এক পণ্ডিতপ্রবর কবির পঙক্তিটি থেকে 'মহাশ্মশান' শব্দটি উড়িয়ে দিয়ে তার পরিবর্তে অবলীলায় বসিয়ে দিয়েছেন 'গোরস্তান' শব্দটি। 'গোরস্তান' আমাদের কোনো

অপরিচিত শব্দ নয়। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার কোনো শব্দ বদলের অধিকার তাকে কে দিল? এ ধরনের হটকারিতা বরদাশত করা মুশকিল।"[২]

ভাষার ওপর এই স্বৈরাচারী নিয়ন্ত্রণ পূর্ব-বাংলার সত্তাকে পীড়িত করে তুলেছিল। সুতরাং প্রতিরোধের রক্ত ঝরল একুশে, ঢাকার রাজপথে। সেই রক্তের সেচনে আরও উর্বর হলো স্পর্ধার জমি, স্বাতন্ত্র্যের অভিজ্ঞান। ৫১ – ৫২-র ভাষা আন্দোলন ক্রমশই বহুমাত্রিকতায় ভর দিয়ে এসে পৌঁছল ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে। কবিরা লিখলেন—

"স্টেনগানের প্রতিটি ঝলকে বাজাল উজ্জ্বল সুর
শৈশবের বল ছুঁড়লো গ্রেনেডে, অকম্পিত সঙ্গিন
বিঁধলো শত্রু দেহ। আমার নিজের ভাই
বড় বেশি ভালো সে বাসতো স্বাধীনতা
জননীর নিষেধ মানে নি, পিতার অবাধ্য হয়েছিল
পতাকার রক্তিম সাহস তাকে ডাক দিলো
স্বদেশের ছবি-রক্তে, ঝাঁপ দিলো স্বদেশের নামে।"[৩]

৭০ – ৭১-এ এসে বোঝা গেল ভাষাকে ঘিরে জন্ম নেওয়া স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনাটি এবার প্রাণিত করেছে স্বাধীনতার সামগ্রিক লড়াইকে। ১৯৭০-এর গণভোটে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রসঙ্গে সমঝোতা করল না ইয়াহিয়া সরকার। ৭১-এর ৭ই মার্চ মুজিবুর রেসকোর্সের ময়দানে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ২৫শে মার্চ শুরু হয় সেনা অভিযান ও গণহত্যা। ন' মাস ধরে চলে মুক্তিযুদ্ধ। অবশেষে বহু অশ্রু, রক্ত, শ্রম আর প্রাণের মূল্যে ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর এল স্বাধীনতা। পূর্ব-পাকিস্তান এবারে হলো বাংলাদেশ।

"এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়
এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।"[৪]

তৃতীয় বিশ্বের উপনিবেশিক হীনমন্যতাবোধ আর আত্মকারুণ্যের মাঝে ৫১ থেকে ৭১; এক দুঃসাহসী অভ্যুত্থান। 'এপার বাংলা'-র মনস্বী ছাত্রসমাজের নিভৃত রক্তেও 'ওপার বাংলা'-র সেই সংগ্রাম সেদিন জাগিয়ে তুলেছিল চাঞ্চল্যের দোল। শঙ্খ ঘোষের স্মৃতিচারণে যেমন—

"আমরা তখন এম. এ. ক্লাসের ছাত্র। আর সেইসঙ্গে দেশচ্যুতও বটে। পুব বাংলা নিয়ে নিভৃত একটা গর্ববোধ আমাদের ছিল। ...

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের যে পত্রিকা বেরোত একসময়ে, সেই 'একতা'র ১৯৫২-৫৩ সালের সংখ্যাটি সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল আমাদের কজনের ওপর। পিছন ফিরে তাকিয়ে আজ মনে পড়ছে, সে-পত্রিকায় এই ভাষা-আন্দোলন নিয়ে দু-দু'টো লেখা ছাপাবার ব্যবস্থা করেছিলাম আমরা। একটি ছিল সংস্কৃতি প্রসঙ্গে প্রতিবেদন, আর অন্য-একটি ছিল নিজের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া দীর্ঘ এক ইতিহাস। ওপার-বাংলা থেকে সদ্য-আসা আমাদের এক বন্ধু সেখানে দেখিয়েছিলেন কীভাবে কয়েকবছর ধরে একেবারে শেষ ধাপে এসে পৌঁচেছে ওই আন্দোলন, কীভাবে লাল কালিতে মোটা মোটা হরফে লেখা প্রকাণ্ড পোস্টার জ্বলজ্বল করছে ঢাকা স্টেশনের গায়ে; "ঢাকা, তুমি জাগো। তোমার সমস্ত বীরত্ব আর মর্যাদা নিয়ে তুমি জাগো। বঞ্চনা আর লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে, স্পর্ধা আর বর্বরতার বিপক্ষে তুমি মাথা তোলো—"।"[৫]

বিশ শতক জুড়ে বাংলাদেশের কবিতা তথা সাহিত্যচর্চায় সর্বত্রই মুক্তিযুদ্ধের এমনই সংরক্ত উপস্থিতি।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহের কাব্যগ্রন্থের প্রথম প্রকাশ যদিও যুদ্ধের উত্তরকালে, তবু নবগঠিত দেশের সদ্যতন সংগ্রাম, মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তসিঞ্চিত স্বাধীনতার অপব্যবহার, যুদ্ধোত্তর অপরাধ ও অপপ্রশাসন তাঁর কবিতার আবেগকে ছুঁয়ে থেকেছে নিরন্তর।

।। ৩।।

"তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা,
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্ত গঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?"[৬]

১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সমসময়ে রুদ্র মুহম্মদ ছিলেন নবম শ্রেণির ছাত্র (জন্ম: ১৬ই অক্টোবর, ১৯৫৬)। যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তাঁর কিশোর মন যখন অস্থির, তখন তাঁকে আটকেছিলেন তাঁর মা। তাঁর বাবাকে ধরে নিয়ে যায় পাক সেনারা। আর প্রথম সন্তান রুদ্র বাবার মতো ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিয়ে এই অন্তঃশীল বারুদ আর অশ্রুকে সঙ্গী করে হাতে তুলে নিলেন কবির কলম। ১৯৭৪ থেকে এরপর তিনি করেছেন একাধিক কবিতাপত্রের সম্পাদনা[৭]। লিখেছেন অজস্র কবিতা, গান, গল্প, কবিতা বিষয়ক প্রস্তাবনা ইত্যাদি। ১৯৭৯-এ প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উপদ্রুত উপকূল'। এরপর ৩৪ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে একের পর এক প্রকাশিত হয়েছে ৭টি কাব্যগ্রন্থ এবং মরণোত্তর আরও একটি কাব্যগ্রন্থ। তবে প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই চিনে নেওয়া গিয়েছিল প্রেমে আর দ্রোহে আমৃত্যু আবিষ্ট এক কবির নিজস্ব লিখনভঙ্গিটিকে।

"প্রাপ্য পাইনি করাল দুপুরে,
নির্মম ক্লেদে মাথা রেখে রাত কেটেছে প্রহর বেলা —
এই খেলা আর কতোকাল আর কতোটা জীবন!
কিছুটাতো চাই— হোক ভুল, হোক মিথ্যে প্রবোধ,
অভিলাষী মন চন্দ্রে না-পাক জোস্নায় পাক সামান্য ঠাঁই,
কিছুটাতো চাই, কিছুটাতো চাই।"[৮]

এই অসম্ভব সম্মোহী অভিমানময় উচ্চারণ যাঁর, তাঁরই কাব্যধর্মের আরেক মাত্রার পরিচয়ও মিলবে এই একই কাব্যগ্রন্থে। সেখানে প্রেমের প্রসন্ন দক্ষিণ মুখ নয়, বরং দ্রোহেই কবি 'রুদ্র'। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 'রুদ্র' কবির পিতৃদত্ত নাম নয়; স্বয়ং-নির্বাচিত সহনাম। হিন্দু-গন্ধী এই নামটি নিয়ে কিছু বন্ধুবান্ধব বা পত্রিকা-সম্পাদক আপত্তি জানালেও এই নামেই সম্বোধিত ও পরিচিত হতে পছন্দ করতেন কবি।

'আজো আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই,
আজো আমি মাটিতে মৃত্যুর নগ্ন নৃত্য দেখি,
ধর্ষিতার কাতর চিৎকার শুনি আজো আমি তন্দ্রার ভিতরে—
এ-দেশ কি ভুলে গেছে সেই দুঃস্বপ্নের রাত, সেই রক্তাক্ত সময়?'[৯]

কবিতার শেষে রচনার স্থান ও কালের এন্ট্রিতে কবি লিখেছেন: '০৩.১২.৭৭, সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা'। এ সময়ে রুদ্র থাকতেন ঢাকার ২১ সিদ্ধেশ্বরী লেনে, বন্ধু বদরুল হুদা সেলিমের বাড়িতে। এরপর ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে (ফাল্গুন, ১৩৮৫) কবি আহমদ ছফার উদ্যোগে ও তাঁরই প্রকাশনা 'বুক সোসাইটি' থেকে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উপদ্রুত উপকূল' প্রকাশিত হলে তাতে সংকলিত হয় কবিতাটি। 'বাতাসে লাশের গন্ধ' এ বইয়ের জনপ্রিয়তম রচনাগুলির একটি। সমালোচক লিখেছেন;

"প্রথম গ্রন্থেই রুদ্র সচেতন পাঠকের দৃষ্টি কেড়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলো। এই গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলোর মধ্যে সবচে' বেশি জনপ্রিয় হয়েছিলো 'বাতাসে লাশের গন্ধ' কবিতাটি। এটি সে 'সমকাল' পত্রিকার জন্য অনিরুদ্ধ হয়ে লিখেছিলো। এই কবিতার কয়েকটি পংক্তি 'জাতির পতাকা আজ খামচে ধরেছে সেই পুরনো শকুন' কিংবা 'ধর্ষিতা বোনের শাড়ি ওই আমার রক্তাক্ত জাতির পতাকা'— প্রবল আলোড়ন তুলেছিলো পাঠকসমাজে।"[১০]

বইটির জন্যে কবি ১৯৮০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ প্রবর্তিত 'মুনীর চৌধুরী সাহিত্য পুরস্কার' লাভ করেন।

গ্রন্থান্তর্গত তৃতীয় কবিতা 'বাতাসে লাশের গন্ধ'। ৭৫ – ৭৬ পর্ববর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, গুপ্তহত্যা, রক্তপাত, জরুরি অবস্থা— এই কবিতার শিকড় সেইসব প্রগাঢ় অন্ধকার আর গভীর হতাশায়। ১৯৭৫-এর ১৫ই অগাস্ট বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে অতর্কিত সামরিক আক্রমণে হত্যা করা হয়। রাজনৈতিক ও সামরিক চূড়ান্ত অব্যবস্থায়, দারিদ্র্যে, নিরাপত্তাহীনতায় ক্লিন্ন রক্তস্রোতের বীভৎসায় সদ্যস্বাধীন দেশ তখন পর্যুদস্ত। এই কি এত রক্তমূল্যে ক্রীত স্বাধীনতার দান? কিংবা এ স্বাধীনতা আসলে এক মহাবৃক্ষ— প্রাচীন, মৃতপ্রায়— অবহেলার রৌদ্রে-জলে একা থেকে থেকে নীরস, বিশুষ্ক হয়েছে তার ন্যুব্জ দেহ। অতীত কীর্তির দীর্ঘ ছায়ায় এখন কেবল ঘনিয়ে আসছে মৃত্যুর অমোঘ নিশান—

"ঝাঁকড়া চুল এক অন্ধ বাউলের মতো
গাছটি দাঁড়িয়ে আছে
অনেক-অনেক দিন ধ'রে
গহন রাতের মত নিঃসঙ্গ, একাকী।
পাঁচিলের গায়ে তার কীর্তিমান ছায়া
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে কেবলই,
অনন্ত ক্ষুধায় ন্যুব্জ বিশীর্ণ শরীর,
হাড় চিনচিনে বোধের বিস্তার
কেবল তাকেই ডাকে
বাঁধানো গোরের মত!"[১১]

স্বাধীন দেশের ভ্রষ্ট রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতিকে কবিতার স্বরে সরাসরি তুলে এনেছেন যেসব কবি, রুদ্র মুহম্মদ তাঁদের অন্যতম। কবির রাজনৈতিক সংলগ্নতাও ছিল যথেষ্ট। তাঁর জীবনীকাররা জানাচ্ছেন '৭৫-এর পরের প্রায় সমস্ত গণ-আন্দোলনে, স্বৈরাচার-বিরোধী সংগ্রামে, মিছিলে, সংস্কার উদ্যোগে রুদ্র সর্বদাই থাকতেন অগ্রণী। মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় সদস্য না হওয়ার সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তবুদ্ধির প্রতি আজীবন বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত থেকেছেন কবি। কবিতাকেও তাই নিয়ে যেতে চেয়েছেন মুক্ত জনমনের কাছাকাছি। সচেতনভাবেই 'কবিতার পাঠক' আর 'সাধারণ পাঠক'-এর মধ্যেকার দূরত্বকে মুছে ফেলে কবিতাকে করতে চেয়েছেন সার্বজনিক বার্তাবহনের হাতিয়ার। তাই অনেক সময়েই তাঁর কবিতা হয়েছে শ্রোতৃপ্রিয়, কিছু উচ্চকিত ও সহজে মনোরঞ্জক। তবুও কবিতার শৈল্পিক অঙ্গীকারকেও অস্বীকার করেননি কবি। বিশেষত 'কবিতা' আর 'অ-কবিতা' বিষয়ে এসব তথাকথিত মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও কবি ছিলেন; তাঁর আজীবনের স্বভাববশতই; বেপরোয়া— ইচ্ছেখুশির তরুণ তুর্কি।

'আজো আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই/ আজো আমি মাটিতে মৃত্যুর নগ্ননৃত্য দেখি'। যুদ্ধ শেষ, তবু যুদ্ধাপরাধের কোনো শেষ নেই। শেষ নেই রক্তের, শেষ নেই মৃত্যুর। 'উপদ্রুত উপকূল'-এর উৎসর্গপত্রে তাঁর আটকোটি উপদ্রুত উপকূলবাসী প্রতিবেশীর হয়ে কবি লিখলেন—

'থামাও, থামাও এই মর্মঘাতী করুন বিনাশ
এই ঘোর অপচয় রোধ করো হত্যার প্লাবন'

নির্বাক দিন, নিস্তব্ধ রাত... সুখ-তন্দ্রার ঘোর বারবার ছিঁড়ে যায় ধর্ষিতার কাতর-করুণ চিৎকারে। মিথ্যা সুখের বুদবুদে ক্ষণিক আচ্ছন্ন হয়ে দেশ আর দেশবাসী কেমন করে ভুলে গেল দুঃস্বপ্নের সেইসব রাত! কেমন করে ভুলে গেল রক্তাক্ত ইতিহাসের দীক্ষা!

পরবর্তী ছত্রে আবারও পুনরাবৃত্ত হয়েছে এই আর্তি— 'বাতাসে লাশের গন্ধ ভাসে/ মাটিতে লেগে আছে রক্তের দাগ'। স্বপ্ন দেখেছিল যারা একদিন নতুন ভোরের, তাদের সংবেদী হৃদয়ও আজ জীর্ণ, ক্লিন্ন, ঘৃণিত যাপনের ভিতর বিকৃত হয়ে গেছে। তাদের জন্যও আজ কেবল জমা হয়ে আছে আঁধার— 'নিষিদ্ধ আঁধার'। 'আঁধার' শব্দের কালিমাকে আরও নিবিড়, আরও নিরালোক করে দেয় এই 'নিষিদ্ধ' বিশেষণটির উপস্থিতি। সময়ের অসুখ মনুষ্যত্বের শেষ অঙ্কুরটিকেও বিনষ্ট করেছে। আলোর আশায় বুক বেঁধেছিল যারা একদিন, আজ তারাই আলোহীন খাঁচার জীবনকে নির্বিবাদে ভালোবেসে জেগে থাকে রাত্রির গুহায়। নবগঠিত দেশের সেসব চালক, রাজনীতিক আর ভণ্ড বুদ্ধিজীবীদের প্রতি বিতৃষ্ণায় তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে রুদ্রর কলম—

"সেলফে বন্দি রবীন্দ্রনাথ, ড্রয়িংরুমে ঝুলে থাকা ধানশীষ
আহা বাংলাদেশ তুমি ঝুলে আছো— আমার সোনার বাংলা
কতিপয় হিজড়া-পন্ডিত আর মূর্খ নেতাদের ডিনার টেবিলে
মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে বিষন্ন বাংলাদেশ উচ্ছিষ্ট হাড়ের মতো।"[১২]

'সোনার বাংলা' আজ স্বার্থগৃধ্নু লোভীদের ভুক্তাবশেষ; ডিনার টেবিলের 'উচ্ছিষ্ট হাড়'। লজ্জিত, খণ্ডিত স্বাধীনতা যেন এক মহতী প্রয়াসের ব্যর্থতম উৎসৃজন।

'এ যেন নষ্ট জন্মের লজ্জায় আড়ষ্ট কুমারী জননী,
স্বাধীনতা— একি তবে নষ্ট জন্ম?
একি তবে পিতাহীন জননীর লজ্জার ফসল?'

কুমারী মাতার আড়ষ্টতা, তদুপরি নষ্ট গর্ভের লজ্জা— এই দুই মিলে যায় যে প্রচণ্ড ব্যর্থ বেদনার বোধে, একাত্তরের রক্তাক্ত স্বাধীনতা যেন তেমনি নিঃসীম হতাশার মুখে দাঁড় করিয়ে দিল দেশবাসীকে।

'জাতির পতাকা আজ খামচে ধরেছে সেই পুরনো শকুন'। জনপ্রিয় এই কবিতার জনপ্রিয়তম পংক্তি এটি। জীবনানন্দের সময় থেকেই আধুনিক কবিতায় 'শকুন' ইমেজের ব্যবহার প্রচুর। বিভিন্ন কবির মনোভূমি ও জীবনবোধ অনুসারে একই বস্তু বা প্রাণীর ইমেজ বিভিন্ন অর্থমাত্রা পেয়ে যায় পৃথক পৃথক কবিতায়। তবুও স্বাভাবিকভাবেই শকুন শিকারি পাখি, মারক শক্তির প্রতিভূ। ধ্বস্ত মুমূর্ষু প্রাণিকুলের প্রতি তার শ্যেন দৃষ্টি। অতর্কিত মৃত্যুর মতো বিরাট কালো ডানায় অবশিষ্ট আলোটুকুকে মুছে ফেলে নির্মম চঞ্চুর আঘাতে ক্ষয়িষ্ণু প্রাণকে খুঁটে তুলে নেবে সে। আর 'পুরনো শকুন'? নিষ্ঠুর ভয়াবহতার সে আরও কঠিন অনুষঙ্গ; ইতিহাসের পুনরাবৃত্ত পাপ-মূর্তি। স্বার্থ আর প্রবঞ্চনার, লোভ আর বীভৎসার এই উপমাটিও তো প্রাচীন। স্বার্থ আর শ্বাসরোধী সংকীর্ণতা নিয়ে দেশে-দেশে, কালে-কালে পুনরাবর্তিত হচ্ছে এই 'পুরনো শকুন'-এর শিকার-বৃত্তি। জাতির পতাকা সে খামচে ধরে বারবার তার পুরনো নখে।

'বাতাসে লাশের গন্ধ—
নিয়ন আলোয় তবু নর্তকীর দেহে দোলে মাংসের তুফান!
মাটিতে রক্তের দাগ—
চালের গুদামে তবু জমা হয় অনাহারী মানুষের হাড়।'

একদিকে দারিদ্র্য আর অনাহার, অপরদিকে রক্তশোষকের অনাচার— এই দুই বিপরীত মেরুর উল্লেখ যথারীতি স্পষ্ট করে তোলে মুনাফা আর বিলাসের উত্তুঙ্গ ন্যারেটিভটিকে। 'নিয়ন আলো'য় নর্তকীর দেহে 'মাংসের তুফান'! এই শব্দবন্ধ নারী-মেদকে করে তুলেছে আরও একান্ত ভাবে বস্তুময়, একান্ত মননশূন্য।[১৩]

এই ভীষণ অন্ধকার আর শূন্যতার ভেতর অতন্দ্র জেগে থাকেন যাঁরা, তাঁরা শিউরে ওঠেন অতীত ইতিহাস থেকে ভেসে আসা ধর্ষিতার চিৎকারে। পুকুরে পানার মতো ভেসে থাকা মানুষের পচা লাশ, আর মুণ্ডহীন বালিকার কুকুরে খাওয়া বীভৎস শরীর রাষ্ট্রের যাবতীয় সংগোপন-চেষ্টা ভেদ করে ভেসে ওঠে তাঁদের 'চোখের ভিতরে', জ্যোতির্ময় অন্তশ্চক্ষে।

কোনো কোনো পশুপাখি, সরীসৃপ— শেয়াল, কুকুর, শকুন বারবার কবিতায় ফিরে আসে মৃত্যুর নৃশংসতা আর শোষণের প্রতীকমূর্তি হয়ে। কুকুরে আর শকুনে কুরে খেয়েছে যে সমস্ত শহীদের দেহ, প্রিয়জনের অপমৃত্যুতে শূন্য হয়ে গেছে যে নরনারীর জীবন, তারা যে প্রত্যেক স্বাধীন নাগরিকের ভাগ্যহত ভাই, দুর্ভাগিনী মা, প্রিয়তম পিতা! অতএব এই স্বাধীনতা সমস্ত স্বজন হারিয়ে পাওয়া একমাত্র স্বজন, সমস্ত প্রিয় মানুষের রক্তে কেনা অমূল্য ফসল। অথচ অমূল্য সেই ফসল নষ্ট করছে আজ পঙ্গপালের ঝাঁক।

'ধর্ষিতা বোনের শাড়ি ওই আমার রক্তাক্ত জাতির পতাকা!'

জাতির নবলব্ধ পতাকার লাল উদয়ার্ক যেন এক মুহূর্তে ঢেকে যায় অসহায়ের রক্তে, অশ্রু-লবণাক্ত অভিশাপে। 'ঘাতক' কবিতায় শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন—

"কে ওকে মেরেছে? সে কথার কোনো উত্তর নেই আজ
এ-মুখে ও-মুখে তাকিয়ে এখন চুপ করে থাকা শ্রেয়।"[১৪]

প্রায় সমসময়ে দাঁড়িয়ে দুঃসাহসী 'ভাষা-কিষান', বেপরোয়া রুদ্র কিন্তু লিখলেন—

"সমতার নামে ক্ষমতাকে কোরে রপ্ত,
আমি জানি কারা জীবনে ছড়ায় পুঁজ, পোকা, বিষ তপ্ত—
জানি আমাদের কারা ধুতুরার ফুলে অন্ধ করেছে অবেলায়,
ছুঁড়ে দিয়ে গেছে নষ্ট নগ্ন বেদনায়।"[১৫]

কবি নন, তিনি শব্দ-শ্রমিক। ভুল বোধ আর ভুল চেতনার ওপর শব্দের লাল হাতুড়ি ঠোকার দায়ভার মোহাচ্ছন্ন, মূঢ় দেশে আজীবন বহন করতে হয় শব্দ-শ্রমিক কবিদের আর কলম-পেষা-মজুর সাহিত্যিকদের।

নেই বোধি, নেই স্থিতি। করতলে বিশ্বাসের শেষতম কোমল রেখাটিতেও ফুটে উঠছে দূষিত ক্ষরণ। সেদিন। আজ। এবং আগামীদিনেও। দেশের সাম্প্রতিকতম রাজনৈতিক পরিস্থিতি আর আর্থসামাজিক অবক্ষয় আজ আবারও প্রকট করে তুলেছে সেই রক্ত-পুঁজ, সেই দ্বেষ-বিষ। প্রতিবেশী আকাশের নীল আবার ছেয়ে গেছে পুরনো শকুনের কালো ডানায়। রুদ্রের ভাষ্য সেখানে আজও প্রাসঙ্গিক।

তবুও;

"তবুতো কোনোদিন একদিন বৈশাখি রাতে জীবন এসে বলেছিলো:
হাড়ের খুলির মাটি কোনো এক বর্ষার পর ঠিকই পাললিক হবে,
খরার মাঠের বুকে দেখো ঠিক মেলে দেবে ফসলের সোনালি পালক॥"[১৬]

স্বদেশ আসলে তো এক ক্রম-নির্মীয়মাণ স্বপ্নভূমি। আর জীবনেরই অপর নাম প্রত্যাশা। অতঃপর, প্রত্যাশার প্রত্যয়ে বুক বেঁধে যথার্থ 'স্বদেশ'-ভূমির সন্ধানে অনন্ত পথ হাঁটেন; হাঁটতে থাকেন 'উপদ্রুত উপকূল'বাসী, স্বপ্নদর্শী এক প্রেমিক কবি...

উল্লেখপঞ্জি ও প্রাসঙ্গিক টীকা:

(১) স্বাধীনতা পূর্ববর্তী পূর্ববঙ্গ কখনো জন্মসূত্রে, কখনো বা কর্মসূত্রে বাংলার বহু দিকপাল কবিকেই লালন করেছে, যাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কিংবা জীবনানন্দের মত মহীরুহ-সদৃশ নামকেও আমরা উপস্থিত দেখব। কিন্তু সম্যক কারণেই (কলকাতা-কেন্দ্রিক এপার-বাংলাই যেহেতু তাঁদের রচনাসমূহের প্রকৃত ধাত্রী) ঠিক 'বাংলাদেশের কবি ও কবিতা'র একান্ত পৃথক ঘরানাটির মধ্যে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না।

(২) রায়, গৌতম (সম্পা.)। 'শামসুর রহমান গদ্য সংগ্রহ'। পুনশ্চ, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০০৫, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ১৭৩।

(৩) কবির, হুমায়ুন। "আমার ভাই", 'বাংলাদেশের কবিতা' (দাউদ হায়দার সম্পা.)। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ: আষাঢ় ১৪২৩, জুলাই ২০১৬, কলকাতা ৭০০০০৩, পৃ. ২৩১।

(৪) হাফিজ, হেলাল। "নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়", 'বাংলাদেশের কবিতা'। তদেব, পৃ. ২৬৬।

(৫) ঘোষ, শঙ্খ। 'একুশে ফেব্রুয়ারি' (দেবাশিস সেনগুপ্ত সম্পা.)। প্রথম বাণীশিল্প সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ২০০৬, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৮৫

(৬) রহমান, শামসুর। "তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা", 'বন্দি শিবির থেকে'। বিভাস, প্রথম বিভাস সংস্করণ: মার্চ ২০১৬, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, পৃ. ১০।

(৭) ছাত্রবয়সে, ১৯৭৩-এ 'নক্ষত্রবীথি' থেকে শুরু করে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪-এ 'অনামিকার অন্য চোখ এবং চুয়াত্তোরের প্রসব যন্ত্রণা' [কবির ব্যবহৃত বানান], ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫-এ 'অশ্লীল জোৎস্নায়', মার্চ ১৯৮০-তে 'Poiema'— ইত্যাদি বেশ কয়েকটি কবিতাপত্রের একক অথবা সহ-সম্পাদনা করেছেন রুদ্র। সাহিত্য সাময়িকীর সচরাচরের নিয়মানুযায়ী অবশ্য এরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত স্বল্পায়ু।

(৮) শহিদুল্লাহ, রুদ্র মুহম্মদ। "অভিমানের খেয়া", 'উপদ্রুত উপকূল'। বুকস্ ফেয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, পৃ. ১১।

(৯) শহিদুল্লাহ, রুদ্র মুহম্মদ। "বাতাসে লাশের গন্ধ", তদেব, পৃ. ১৪।

(১০) চৌধুরী, কামাল। 'রুদ্র: অমলিন স্মৃতি'। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৫ জুলাই ১৯৯১, প্রাপ্ত: বাগচী, তপন, 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ' (জীবনী গ্রন্থমালা), বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জুন ১৯৯৮, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৫, ঢাকা ১০০০, পৃ. ৩০।

(১১) হাফিজ, দিলারা। "এই স্বাধীনতা", 'বিভাব'। আন্তর্জাতিক কবিতা সংখ্যা (সম্পা. সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ও আরতি সেনগুপ্ত), ৮৬-৮৭ সংখ্যা, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০০০।

(১২) শহিদুল্লাহ, রুদ্র মুহম্মদ। "ক্লান্ত ইতিহাস", 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর রচনাসমগ্র' প্রথম খণ্ড। (সম্পা. অসীম সাহা), বিদ্যাপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, বাংলাবাজার ঢাকা, পৃ. ৬১।

(১৩) ১৯৭৪-এর ফেব্রুয়ারিতে 'অনামিকার অন্য চোখ এবং চুয়াত্তোরের প্রসব যন্ত্রণা' কবিতাপত্র সম্পাদনার সময়ে 'একুশ তুই আর আসিস না' নামে এক সম্পাদকীয় লেখেন রুদ্র। মহীয়সী স্বাধীনতা, মহান

একুশ যেন কয়েকটি মাত্র বছরের পেরিয়েই পরিণত হয়েছে হেলাফেলার ছেলেখেলায়, বাজারের নর্তকীতে। রুদ্র লেখেন—

'ক্যানো আসবি, কার কাছে আসবি? তোর বুকের গরোম রক্তের স্পর্শে একদিন নিষিদ্ধ বিক্ষোভ হোয়েছি। অপ্রতিরোধ্য ব্যারিকেড গোড়েছি। কৃষ্ণচূড়ার বিক্ষুব্ধ লাল ছুঁড়ে দিয়েছি তোর সুনীল করতলে। কিন্তু আজ তোর খোঁপায় রজনীগন্ধা অথবা স্মিত হাসি ভালো লাগে না আর। আমরা তোর অন্তর্বাসে হাত দিয়েছি। কী কোরবো বল, কিছুই পাই নি যে আমরা! মেনড্রাক্স আজ একমাত্র সংগী— সম্বল একবুক জারজ স্মৃতির বিষ। তোর মর্যাদা দেবার মতো কিছুই নেই।

আর আসিস নে হতভাগী। সত্যি বোলছি এবার এলে নিশ্চয়ই তুই সতীত্ব হারাবি।'

[বানান কবির নিজস্ব। বাংলায় উচ্চারণানুগ বানান ব্যবহারের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি।]

দুঃসময়ের পাশবিক ক্ষুধাদৃষ্টির সামনে একুশ এবং বঙ্গরমণীর অধোগতি সমজাতীয়।

(১৪) ঘোষ, শঙ্খ। "ঘাতক", 'শবের উপরে শামিয়ানা'। অনুষ্টুপ, প্রকাশ: ডিসেম্বর ১৯৯৬ কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৪০।

(১৫) শহিদুল্লাহ, রুদ্র মুহম্মদ। "শব্দ-শ্রমিক", 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর রচনাসমগ্র' প্রথম খণ্ড। (সম্পা. অসীম সাহা), বিদ্যাপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, বাংলাবাজার ঢাকা, পৃ. ২৬

(১৬) শহিদুল্লাহ, রুদ্র মুহম্মদ। "মাংশভুক পাখি", তদেব, পৃ. ২৮।